অজ্ঞাতবাস (১৯৫৭)

প্রকাশক সাহিত্য কলকাতা ২০ পক্ষে সমীর মুখোপাধ্যায় পরিবেশক কাব্যকোণ
৩২ কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন কলকাতা ২৬ মুদ্রক রাজেন্দ্র প্রিণ্টার্স
৪১/১ হিদারাম ব্যানার্জি লেন কলকাতা ১২
প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৭২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ দাম দু টাকা

তেত্রিশ পেরোলে

তেত্রিশ পেরোলে পরে দ্বাদশ মন্দির
গাম্ভীর্যই চোখে ভাসে...কত নাম অঙ্কিত পাথরে,
কারো নাম ঠিক মনে নেই—
স্মৃতিকেও নক্ষত্রঝরার শব্দে ভোরের শিউলিডাল নেড়ে
কুড়োতে চেয়েছি। কারো নখরে নিষ্পিষ্ট বাসন্তীর
কাপড়গুলিকে ধোপা নির্মম আছাড়ে
হলুদ গাধার পিঠে বস্তা বেঁধে উপহাস করে গেছে কবে
কতদিন আগে।
তিনের পিঠেই তিন ত্রিকোণমিতির
চারিদিকে ভয়ানক চামচিকে ছায়া ফেলে যায়...
আরো ভয়ানক এই তেত্রিশ বছরে
তেত্রিশটি নারীর স্বপ্নে
অসম্ভব ফুল ফোটানোর আয়োজন
অক্লান্ত শয্যায়...
এখনো ত ফুটে আছে উদ্ভিদ উদ্যান।

তুমি

পায়ে ব্যথা লেগেছিল হেঁটে যেতে মন্দিরদর্শনে
নাকি কোন পিকনিকে—আজ মনে নেই,
শুধু পিছন থেকেই চারুশীল গমনভঙ্গিমা
আজো মনে আছে। শুধু ভঙ্গিমাই চিরস্মরণীয়...
আর সব ঝরে যায়... আজ তুমি দিদিমণি স্কুলে
ভারী চেহারার, তুমি অনর্গল আমিত্ব প্রচারে
বিশ্ববিজয়িনী। সব ধুয়ে মুছে গেছে...
কেবল স্মৃতির মত ছবি
কেবল ছবির মত একা
মনে থাকে শ্মশান অবধি।

অন্য দুপুর

ইঁদারার পাশে কুবে দুপুর ঝিমোত…
স্নান সেরে ফিরেছে সবাই…
সাবেকী প্রশস্ত খাটে নিদ্রাভিভূতার
শান্ত আত্মসমর্পণ…কারণ প্রকৃতি চারিদিকে ;
যখন মানুষ পরিণামদর্শনের সব কথা ভুলে যায়
তখনই প্রকৃতি আসে—কে না জানে সেই
পাগল হওয়ার কাল।
উত্তাপে সেদিনও সেই ভয়ানক প্ররোচনা ছিল—
ভঙ্গিমায় মাঝে মাঝে এত আকর্ষণ,
শয়নভঙ্গিমা কোন বৈশাখী বৃক্ষের স্মৃতি জাগরূক করে…
দেয়ালে প্রাচীন কোন স্বাভাবিক ছবি…
সমস্ত বাড়ি ও ঘর বাইরে বাগান
জ্বলেছিল ভীষণ আগুনে—
সেদিনের সুদূর উত্তাপ, জ্বালা স্মৃতির ভিতরে
আজো কাজ করে।

দাবী

আট বছরের দাবী ভোলা ত সহজ নয় মোটে—
কারো কারো চিরকাল বসন্তের আয়ু
একভাবে স্থির থাকে, উপচার লাগে না কখনো…
জামা জোড়াতালি দিয়ে বড় করবার প্রয়োজন
থাকে না বুঝি বা, শুধু আটটি বছর আগে-পরে থাকে সমান সমান
পুরনো দাবীও তবু ব্যবহারহীন হলে পরে
ভীষণ জঙ্গলে ভরে যায়, পায়ে-চলা পথগুলি
আগাছায় ঢাকে, মন অন্য সব ভাবনার ভিতরে
ডুবে যায়—
সময় হস্তাবলেপে দাবীও নিশ্চিহ্ন করে দিলে,

আট বছর আট বছর
ম্লান এক নামতার সংখ্যায়
ঘুরে ফেরে রঙহীন বসন্তের বায়ু।

প্রবাসিনী

শেষ দেখা হয়েছিল কতদিন আগে—
তখন শরীর সারতে মধুপুর, জসিডি, গিরিডি
প্রায়ই শোনা যেত মুখে মুখে,
সেইখানে দেখা হয়েছিল শেষবার...
তোমরা পাহাড়ে ছিলে দূরে ছিলে দশ বছর আগে
তোমরা সেখানে সেই কলম্বাস প্রথমাবিষ্কারে
আকাশের আশীর্বাদ পাতা ফল পাখি সব, সব
পেয়েছিলে...
অত সচ্ছলতা কিংবা ঔদার্যের ব্যাপ্তি
কলম্বাস দেখিয়েছিলেন কোন বিশ্রুত ভূগোলে।
আজ এতদিন পরে
রক্তের বন্ধন খুঁজতে দেশে ফিরে এসে
কেবলই বেতালা দুঃখে শোকে...
কাকাবাবুদের বাড়ি বিক্রি হলো শুনে
যে যেখানে দূরে দূরে সব বাড়ি বিক্রি হয়ে গেলে
কলম্বাস দেশে ফিরে যায়—
সেই সব ছবি ভেবে শরীর সারার প্রহসন
মনে পড়ে,
কেন ফিরে এলে, কেন এতদিন পরে,
এখানে শরীর, মন কোনখানে পাবে

কাঠের সিঁড়িতে

মনে জানি কাঠের সিঁড়িতে বড় বেশি শব্দ হয়—
খড়মের শব্দ সারা বাড়িতেই গাম্ভীর্য ভীষণ

যেন প্রচলিত করে।
আমাদের বেলতলার ঘর থেকে রাতে শোনা যেত
ব্রহ্মদৈত্যদের আনাগোনা,
তখন বুঝিনি ছিল এঘর ওঘর কিংবা এবাড়ি ওবাড়ি
আর্য অভিসার বয়স্কের...
নিজের ভিতর দিয়ে কত খুঁটিনাটি
আজ স্পষ্ট হয় যত গুপ্ত আবিষ্কারে ;
আজো কাঠের সিঁড়িতে শব্দ কানে শোনা গেলে
যেমন একটি শব্দ বুঝে নিতে পারি,
একদিন সারারাত ওরকম শব্দ ছিল খড়মজোড়ার।

কলম

সদর্থে ও অসদর্থে কলমের চেয়ে প্রিয়তর
অন্য কিছু নেই। মনোবিজ্ঞানীরা এই কথা বলে,
কলমের গাছ বলতে সেই সব নিচু নিচু ফলভরা গাছ
বয়সের বহু আগে ভরা ভরা আকর্ষণ করে...
সারা বুকে কলম সাজাই রাশি রাশি
রাস্তায় দোকানে সারি সারি,
মনের মতন তবু সূক্ষ্ম মোলায়েম
সূচ্যগ্রপ্রমাণ সেই মুখ
কিছুতে পাই না কোন দিন—
কিছুতে ফোটে না সেই মুখ—
প্রিয় কলমের কথা যদিও ভেবেছি বহুকাল।

পিছন থেকে

পিছন থেকেই কত কল্পনা সম্ভব
চিরকাল, সম্মুখ দেখি না।
সম্মুখের ফুলবল্লরীকে
বৃক্ষের আভাসে চিনে রাখি...

কতকাল হেঁটে-চলা
কতকাল চলার ভেতরে
অপেক্ষার পায়ের ছাপের
কোমলতা আছে
মুখ ফিরোতেই চূর্ণ, চূর্ণ সব আশা
অসংখ্য প্রস্ফুট লাল ব্রণ
কোনো আশা চূর্ণ নয়
সম্মুখে যৌবন চলমান।

রোমাঞ্চ

পায়ে রোম রোমাঞ্চের পূর্বাভাসে বুঝি
ঢাকা দিয়েছিলে বস্ত্রে নতুন কার্পাসে
ভুলে মাঠে যে-রুমাল ফেলে চলে আসি
সে-সব হারিয়ে গেলে কুয়াশায় পাওয়া অসম্ভব
যদিও সৌরভ কিছু-কিছু ঠিক থাকে
আগেকার মতো। স্মৃতি ভীষণ কুকুর
অবিকল নিয়ে চলে পূর্বপথে, সেই একই জলে
অবগাহনের সুখে নিয়ে যেতে পারে
অথচ পারে না সবটাই…
ঘরের সামনেই সেই মহার্ঘ পাপোষ
সব শব্দ ছাদময় বারান্দায়
ঘরে এসে স্থির হয়ে গেলে
মনে হয় সব ঢাকা আছে
সমস্ত রুমাল ঢাকা আছে কুয়াশায়
পাই কেবল সুরভি।

তালাচাবি

পিছনে আঁচলে চাবি ঝোলে, মুখে স্বাভাবিক তালা,
একটি কথাও অনায়াসে বেরোবে না—

একগুচ্ছ চাবি থেকে খুঁজে নেওয়া অব্যর্থ চাবিটি
ভীষণ কঠিন। নাম ছিল নীলোৎপলা,
দলগুলি মেলবে বলেছিল লাল সূর্যের আলোকে
দেখাবে কোরক গন্ধভরা...
অবুঝ মৌমাছি শুধু কতবার ঘুরে ঘুরে যায়,
উড়ে যায়, খোলে না কখনো সেই তালা ;
বৃথা সত্যবাদিতার বোকা বোকা প্রতিশ্রুতি নিয়ে
কাটিয়েছি দীর্ঘ চিরকাল,
এখনো তালার মত মুখ
এখনো মুখের কাছে তালা।

ভ্রমণের পরিবর্তে

১. ভ্রমণের শেষে ফিরে একমাত্র বুঝি
ভ্রমণের নেই প্রয়োজন।
শুধু একমাস বড় পিছিয়ে পড়েছি,
ডাকবাক্সে আকণ্ঠ জমেছে চিঠিগুলি
খবরের কাগজের গোলাগুলি অব্যর্থ নিক্ষেপে
দোতলার বারান্দা বোঝাই।
পাশের ফ্ল্যাটের ওরা এর মধ্যে কবে উঠে গেছে
ঠিকানা না-রেখে। এত ধুলো, এত ঘরভরা
অগোছালো সব কিছু। কত কী ভাবার
সময়ের অপচয় ঘটে গেল ক'টি দিনে। ঘরে ফিরে এসে
মানানো সহজ নয় নিজেকে মোটেই। হায়, হায়
পাশের ফ্ল্যাটের ওরা কবে উঠে গেছে
পাশের ফ্ল্যাটের ওরা
পাশের ফ্ল্যাটের ওরা
না-তোলা সাউণ্ডবক্স গ্রামোফোনে ঘুরে ঘুরে যায়।

২. ভ্রমণশেষের অবসাদ নিয়ে ঘরে ফিরলাম।

ভ্রমণ যদিও আজকাল শিল্পরূপে
প্রচলিত, তবু সারা পৃথিবীতে কয়েকটি মাতাল
এদেশে ওদেশে মুদ্রাবিনিময়ে সহায়তা করে…
যেন অক্ষিগোলকের ভিতরে কৌতুককর এক
রঙিন খেলার পাখি ওঠানামা করে, তাকে ডানাভাঙা এনে
কোমল মোমের স্পর্শে জোড়া দিয়ে যাই।
পালকে অনেক রং লেগে আছে। কিছু তীর্থজল
শিশিতে সংগ্রহ করি, বিচিত্রিত ধুলো
জমে আছে, সেই সব গোপন দ্রব্যের
মুখ খুলে মাঝে মাঝে গন্ধ নেওয়া, চুপি চুপি প্রেমিক পত্রের
অক্ষরে বুলিয়ে যাওয়া চোখ, কিংবা শুধু স্মরণের
মুহূর্ত অনেক…ইজিচেয়ারের আলস্যে এখন
মনে-আনা অবিস্মরণীয় সেই একটি গোলাপ
ভ্রমণ-বাসরে দুজনের।

স্মৃতি থেকে

ভোরবেলার ফুলতোলা পদচারণার ক্ষেত্র বুঝে কোনদিন
হয়ত হবে না আর, চণ্ডীতলা দূরে সরে যাবে…
প্রথম বাসটা ছাড়তে তখনো অনেক দেরি, মর্ণিং স্কুলের
ঘণ্টা পড়া, 'দিদিমণি' বলে সেই এসকর্ট চারুদি
বি-এ পাশ ভঙ্গিমায় তখনো ডাকে নি একে ওকে,
এমন কি পিপল পাতা ছাগলের ভোজ্য বলে যারা
দিবাচর নিশাচর তারাও কোথায়, কিংবা পিপল পাতার
প্রয়োজন জানতো সেই মাখনবিক্রেতা, কিংবা বালতি হাতে
ঘুরোনো আইসক্রিমঅলা, ওরা কেউ নেই—
তোমার হলুদ রঙ মনে করে আমি কি সরিষা
ক্ষেতের মায়াবী আলো মনে মনে জমিয়ে রেখেছি,
সেই ক্ষীণ ক্যাকটাসে
হলুদ ফুলের মধ্যে শাড়ির আভাস, শুদ্ধ ভাষা

বাগস্তা বলেছে যাকে। চণ্ডীতলাতে কি
তোমার মানত ছিল ভিন্ন ভিন্ন, আমি তা বুঝিনি…
প্রতিবিম্বহীন সেই ভালবাসা, পাহাড়ে হারানো প্রতিধ্বনি,
স্বপ্নে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখা দিলে বেদনা অস্বর
কণ্ঠরোধ করে, সেই না-বলা তোমার চোখে বেদনা কি ছিল,
কখনো দেখি নি। আজ
পদচারণার ক্ষেত্রে জমে যায় অযত্নের ঘাস।

যবে জেগে ছিলে

জেগেছিলে কত রাত। পায়ের লোমের মধ্যে সলিতা পাকানো
প্রদীপের, আসন্ন আরতি ছিল সময় অনেক কাটাবার,
আর কুন্দমালা ছিল সূচবেদনার—কিংবা কত পত্র লেখা
অক্ষত সখীকে, নিদারুণ বড় বড় অভিজ্ঞতা সব বলবার ছিল
আভাসে, ছায়ায় ঢেকে…মনের চেয়েও বেশি গতি কার আছে
এই সব ধাঁধার মতন কথা দিনরাত ভেবে
শিশুমাসিকের শেষ পাতাগুলি মনেই পড়ে না
নাবালিকাকালে নাকি যা ছিল সহজ।
পুরনো দিনের বহু অভ্যাস এখন
কাটাবার প্রয়োজন আছে—ঋতুপরিবর্তনের
যেমন প্রত্যক্ষ চিহ্ন গ্রীষ্মে কি বর্ষায়, কিংবা হঠাৎ শরতে
একদিন সব দরজা খুলে যায়, নীল নির্ঝরের
স্বপ্নভঙ্গ হয়, দূরে আকাশ আকাশ বলে ডানার চিৎকার…
বুকের ভেতর থেকে যৌবনের সুচিরকালের
কথাগুলি নক্ষত্রফুলের মত, রাত্রিবিজ্ঞাপনী
জ্বলে, নেভে সৌধের চূড়ায়। সারারাত্রি জাগরণে
কাব্যভাষা সৃষ্টি হয়…আজ এই মুহূর্ত তোমার
জেগে আছে চারিদিকে ঘুমের ভিতর
যখন সমস্ত কোণে জ্ঞানবান অভিজ্ঞ সকলে

অসহায়, মূর্খ, অচেতন।

দশ বছর

নিরহঙ্কার কে ডেকে গেছে শেষ গোধূলিতে
ম্লান অন্ধকারে,
সব পরিবারসহ বৈকালী ভ্রমণ, কেনাকাটা—
দশ বছরের বন্ধু গল্প করে করে
হাল্কা করতে চেয়েছিল বয়সের ভার···
ঘন চুলে কে প্রেয়সী পায়ের ওপর থেকে জল মুছে ছিল,
বলেছিল—হয় নি বয়স,
কোনখানে ছিল না বয়স—গাছে, কিংবা পাতায় শাখায়··
দশ বছর পরে সব যথাযথ আছে—
বৃক্ষ, ঘর, ফার্নিচার, দেয়াল, ঘড়িটা।
শুধু চিন্তা, চিন্তার ভিতরে
সোনালী রূপোলী রেখা ভিড় করে আসে ;
দশ বছর আরো পরে
আরো বহু দশ বছর কাটে
নিরহঙ্কার যে ডেকে যায় সেই ডাকে চিরদিন দূর
ভীষণ বয়স।

জ্বর

জলে ভিজে ফলঅলাটির মত
কেবলই সৌগন্ধ্যে ভরে দেবে
সমস্ত পথের চলাচল...
জলে-ভেজা নৌকোর ছবিটি কোন পুকুরঘাটের
স্নানসিক্ত মায়াবী ছবির আহ্বানে
ভীষণ ব্যাকুল রাখে। সারাদিন, সারারাত সেই
জলের তরুণ শব্দ দুপুরের তীক্ষ্ণ কড়ানাড়া

প্রসাধনদ্রব্য উপযাচিকার,
যেন সবই আঁচলের প্রান্ত ভরে দিতে
ফুটে আছে।
জলে ভিজে বাইরে শীতল…
ভেতরে রক্তের তাপে তরঙ্গিত সমস্ত শরীর…
হাতে কি উত্তাপ এত হাত চেপে-রাখা
এখন হয়েছে খুব জ্বর ?

স্লেটে

সম্প্রতি কবিতা লিখছি স্লেটে, বোধোদয় আজো খুবই প্রয়োজন,
আখ্যানমঞ্জরী চাই, প্যারিচাঁদ মিত্তিরের টাকমাথা আইকম বাইকম
সমস্ত ভীষণভাবে তাড়া করছে, বালকের তাড়া
রক্তের নদী ও নালা বেয়ে যায়, যখন মোটেই
প্রেম আর জমে নাকো, হয় নাকো, করে নাকো কেউ—
সমস্তই শেষ হলে পড়ে থাকে বালকবালিকা,
সেকারণে কবিতাও শুধু খেলা, হাতমক্স করার দস্তানা…
মুছে দিয়ে বারবার দুপুরবেলার কোন ওয়ার্ডমেকিং
স্লেট ও হবে না আর কোন অনুশাসনের কালো গাত্ররূপ।

জীবন একটি কেরানির নাম

শিল্প মাঝে মাঝে বড় কৃত্রিম, রক্তের দান চায়
হয়ত আরেক ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর কাজে নেমে যান সেই অবন ঠাকুর
কাঠিকুটো মাটি নিয়ে অন্য এক শিল্পের আধারে,
রবীন্দ্রনাথের ছবি, সেক্সপীয়রের কালো মেয়ে
গতকাল কেনা সেই মাটির পুতুল কিংবা বাঁশের ফুলদানি
ছবিতে চন্দনটীকা, মেঝের আলপনা
ভীষণ কৌতুককর মাঝে মাঝে ;
তখন এমন সব আপাতদৃষ্টিতে হাস্যকর

কাজে মন বসে—যেন ছাদে ঘোরে ওবাড়ির মেয়ে,
আকাশে দুপুর যেন নীল স্বচ্ছ পুকুরের জল
ঢেলে রেখে গেছে।—কেন অভিমানী বুকের ভিতরে
কীর্তি, যশ, ছোট ছোট কথাবার্তা তরুণীর স্তনের মতন
নাচানাচি করে, আর কানিসে যেসব কাজ চড়ুইয়েরা করে
সমস্তর মধ্যে শুধু বক্তৃতাশেষের অবসাদ
নেমে আসে পার্ক থেকে। দেয়ালে বাঁধানো
নিজের ছবিটা খুলে ছুরি মারি, পদাঘাত করি ইচ্ছে যায়,
মনে হয় ক্লান্তির বিকেলে ঐ ঘরে-ফেরা কর্মচারীটির
লণ্ঠনের সলতে উস্কে দিয়ে চলি রাত্রির ভিতরে,
ওকি র‍্যাবো নিরুদ্দিষ্ট, শিল্পকে বিদায় করে জীবনের পথে?

বাইরে দাড়িয়ে

টেলিফোন কিওস্কের ভেতরে তোমার গোপনতা
কিছুকাল মনে থাকবে, তোমার চোখেই ছিল হিংসার কৌতুক···
বোবা-কালা ছাত্রের মতন সব মুখ-নাড়া চোখ-নাড়া দেখে
বলে দিতে পারি ঠিক এইমাত্র বিচ্ছেদের পাখিটির কাছে
কাচঘর মুহূর্তের লাসকাটা ঘর, যেন গ্যাসচেম্বারেই
সন্ত্রান্ত সোনার দাত খুলে পড়লো, মুর্গিদের চোখের পর্দাটা
খোলে যথা টেবিলের উল্টোদিকে রান্নাঘরে·· বাবুর্চি মাস্তান
সভ্যতার সদ্‌গুরু, অনায়াসপ্রযত্নের জন্যে নাকি মান্য মহত্তর।
তোমার কণ্ঠের ভাল ভাল শব্দযোজনায় খুব বড় থিসিস সম্ভব,
ফাঁকা বুকে ফাঁকা উচ্চারণ শুধু নিরন্ত কৌতুক ভয়াবহ···
বর্তমানে বেঁচে আছি, আছি একপায়া কোন বাঁশের সাঁকোতে,
নীচে বয়ে যায় নদী, মাছশিকারের জন্যে গ্রাম্য বালিকারা
স্বল্প বস্ত্রে সজ্জিত যেখানে—হয়ত গভীর সব প্রয়োজনে লজ্জা ভুলতে হয়,
হয়ত জীবন, প্রেম, কাব্য, শিল্প সমস্ত কিছুতে
ভঙ্গুর লজ্জার কোন স্থান নেই মোটে—
তুমি কিওস্কের মধ্যে, আমি বাইরে চলমান আইসক্রীমঅলা

ঠাণ্ডার ভিতর ডুবে যাই, জমে যাই ভীষণ ঠাণ্ডায়,
তুমি বিচ্ছেদের পর কেন যুগ্মতায় ফের বেঁধেছো নিজেকে·
আমি বাইরে দাঁড়িয়ে
আমি চিরকাল আছি বাইরে দাঁড়িয়ে।

কোন কিছুতেই

কোন কিছুতেই
কোন কিছুতেই তুমি তৃপ্ত নও
বড় ভয় হয়···
কখনো এ-বই পড়ো কখনো ও-বই—
ক্লাবঘর, বাড়ি, রাস্তা, ফলকেনা, দোকানবাজার;
ছুটি নিয়ে সমুদ্র, পাহাড়, বন—সুদূর, নিকট ;
বড যন্ত্রণায় আছি অধুনা আমি যে,
জাপানী ধরণে রাখি ঘর, ছবি দেয়াল বদলায়,
ঈশ্বরের অভিনয় শিখে ক্লান্তি অবমোচনের
চিকিৎসাপদ্ধতি খুঁজি নিরন্তর—যদি গ্রীষ্ম বর্ষা ঋতুগুলি
ভিড় করে আসে এই প্রকাণ্ড বাড়িতে,
আজকের ময়ূর হয় কালকের কোকিল—
হয় না তা, বুকের পাথর বড় বেশি ভারী লাগে,
বড ভয় বড় ভয় করে···
কিছুতেই তৃপ্ত নও যদি
আমাকেও ক্লান্তিকর প্রথা মনে হলে কোনদিন
কী করে দাঁড়াবো !

চুরি

চুরি করবার মত কোন ফুল রাখোনি বাগানে,
নষ্টচন্দ্র ছায়ায় মিলালো, এত রোমাঞ্চ সিরিজ

পড়ে পড়ে মাথা ভার হলে যেন কিছু করা যায়
এই বোধ ভীষণ ভাবায়—
কেন 'শিখিনিক' জোর কিংবা বুঝি জোরও নিষ্ফল,
আমি হলচালনায় আর্য আর্য প্রয়োগ জানি না
যদিও গঙ্গার তীরে শুয়ে আছি নিরবধিকাল
ঊর্ধ্বতন একুশ পুরুষ·· ···
আজ কোন ফুল আর পাব না বাগানে
চুরি করবার হাত দীর্ঘদিনে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

অবেলা

অভিধান মুখস্থ করার কাজে মত্ত কেউ শৈশবে পাগল :
ওয়ার্ডবুকে পোর্টিকোর মানে গাড়িবারান্দার ছড়ানো বাগানে
ঝিমোতে দেখেছি, আর গাড়িগুলি দাঁড়ায় না মোটে,
চায়ের কেটলিতে জল ফুটে গেলে কে আবার পুনরাবিষ্কারে
নতুন আর এক যান সৃষ্টি করবেতাই ভেবে ভেবে
দেখে নিতে চাই সব বড় বাড়ি যা নাকি ভূতুড়ে,
সব তোমার আদর্শে গড়া ছিল, কি নিশুতি দুপুরের ঘুম,
হাঁটছে কি হাঁটছে না লোকে, টিক্কা গাড়ি সিক্কা টাকা বহু,
খিদমদগার দূরে আলবোলা ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যায়—
সেই সব প্রেমিকার মুখ মনে করে আমি দেয়ালে দেয়ালে
ধুলো ঝাড়ি ছবির ওপর থেকে, সেই সব ফোলা মুখগুলি,
মোটা মোটা হাত, বুক আশ্চর্য বিরাট কোন বালিশের মত···
কিছুকাল ফিরে যাব সেই সব গাড়িবারান্দায়
ভোরবেলার চাকরি নিয়ে যদি দরজা খুলতে হয় ভালো
স্পষ্ট দেখবো সাহসিক ছড়ি, বুকে ঘড়ি কালো-সুতো-বাঁধা,
সারারাত বাইরে কাটিয়ে কারো চোখের তলায় ম্লান কালির আমেজ
এবেলার শিষ্টতায় ক্লান্ত হলে অবেলার আকাশ সাজাবো।

চিঠি

কার বাড়ি যাব রাতে নক্ষত্র যখন
সমস্ত পথের চিহ্ন এঁকে রেখে গেছে,
ছোটপিসিমার সেই শেষ-দেখা মন্দির কখন
বাদুড়ের ওড়াউড়ি ঢেকেছে, তেঁতুল গাছে গাছে
ভয়ানক বাসা সব, বিরাট তক্ষক চোখ খায়
আকন্দের আঠা যদি চোখে লাগে চোখ কানা হয়…
নিজের বাড়িই কবে ভেসে গেছে, হাতের পুঁটুলি
লাঠির ডগায় ঝুলছে খালি, ভাসি জোয়ারের জলে,
ধুলোবালি জমতে জমতে এখন তালকানা এই সমস্ত জীবন
ছোটপিসিমারা সব কোথায় গিয়েছে, আজ কদ্দিন দেখি নি…।

চড়ুইভাতি

সব চলে গেলে শুধু পড়ে আছে শস্য,
মরশুম স্রোতের ঝর্ণা, ছুটি, বিরামের হাতঘড়ি
কিছুক্ষণ ছিল কাছে—ডাকবাংলোর কালো চাপরাসীগুলি
বড় প্রিয়জন, ভাবি গাছের পল্লবে যত নাম
কতকাল মনে রাখবে, ইংরেজি সনেটে সেই উদ্ধত ত্রিপদী
মনে রাখা মনে রাখা করে যেন দাম্পত্য বিরহ
সমস্ত বাড়িতে। ঐ চড়ুইভাতির হাঁড়িগুলি
কখন যৌবন ভেঙে টুকরো-টুকরো রেখে চলে গেল
নিয়ে গেল খেয়ালের বিলম্ব আলাপ মাঝরাতে,
পুরনো চিঠির ম্লান ভাললাগা…প্রেমিক একজন
কতকাল শুয়ে আছে বুকে নিয়ে নিশ্চল নিঃস্তব্ধ ভাবধারা।

যে কেহ মোরে

অভিমানী, এতদিন শূন্যবিহারের ফলে নাকি রক্তশূন্য তুমি,
আকাশে আপেল নেই বর্ষার কদলী কিংবা মাংস শুয়োরের

কিছু নেই—রাজশেখরের ক্ষেত থেকে চুরি করে একলক্ষ
এমুঠো ওমুঠো
পাঞ্জাবী চায়ের ঢালা-উপুড় তরঙ্গে তপ্ত; পাহারাদারেরা বড়
বোকা
চিরিমিরি জঙ্গলের খৈনিসহ কাটনি চুন পেলে
ভয়ানক খুশী, তাই অকাতর প্রত্যেকের আছে নিমন্ত্রণ
সাহিত্যে, প্রেমের মতো সকলেই দুবার তিনবার বহু টিকিট
কিনলাম,
কিউ দিয়ে মারামারি করতে খুব ভাল লাগে ; হে
অভিমানিনী
চিরনমনীয় কমনীয়তায় ডুবে থেকে আমি
বুঝেছি অসীম শক্তি আছে যে তোমার তাই যে যেমন
পারে অনায়াসে
তোমাকে চালায়—তুমি অস্ত্রাঘাতে পটু,
আপাতত কিছু রক্তমোক্ষণেই প্রমাণিত হবে স্বাস্থ্যার্জন।

১৯৬৪

রেল কোয়ার্টার্স থেকে

নিয়মকানুনে বড মাঝে মাঝে ভাললাগা থাকে…
ওদিকে যেয়ো না, লোহা, ব্যালাস্টের ওদিকে অনেক
ভয় আছে, প্রতিবছরেই কারো বিবাহবার্ষিকী
ওখানেই শেষ হয়, সেইসব মেয়েরা ভীষণ
আহাম্মক, ওদিকে গায়ের সব লোকজন থাকে—
ছোটবাবু মেজবাবু তুচারজন এরা ঢের ভালো,
জানালায় মুখ ঝুলিয়ে ছ'টি ট্রেন যেতে-আসতে দেখো,
দেয়ালের·ঘড়ি শুনো ; লাল ঢেউখেলানো·ছাদের
তলায় নিঃস্তব্ধ সুখ—চারটে হাঁস পুষেছ বুঝি বা
ওরা নিয়মিত সব ডিম পাড়ে এর পরে ওর পরে
কিংবা একসঙ্গেই সকলে।

পেপারব্যাক

পেপারব্যাকের পিঠে ঠেসান দিয়েই কাটলো সারাটা দুপুর,
মুখ থেকে সরাচ্ছিলে চুল, তবে এখনো কি মাথা ধরে খুব,
চুইংগামের মত ক্লান্তি অপনোদনের এই দৃশ্যাবলী
পেঙ্গুইন ক্যাঙারু প্রভৃতি বহুদিন বড় পরিচিত—
কোন কথাতেই তুমি ভেজো নি, মোটেই বুঝি হলে না নিবিড়,
কারণ সংসারে বড় দাম লাগে দুধ বাটি কাঁসা ও পিতল···
শান্ত কোন দাক্ষিণ্যের প্রাচুর্যে কি ভরবে বাড়িখানা
বিপিনবাবুরা নাকি চারপুরুষে লটারির টিকিটের ঘর
বানিয়ে ফেলেছে, ঘোড়া কখনো ত ঈশ্বরের মত মুখ তুলে
বলে নি—নিয়ে যা, শোন্ ধনপুত্রে বাড়ুক সংসার···
সংক্ষেপের আয়োজন, সস্তাফুল, শয্যার বাহার,
তোমাকে পেপারব্যাক উপহার দিলাম, ঐ প্রচ্ছদ কাগজ
হাতে নিয়ে দেখো ওরা একবস্ত্র, সারারাত দিলাম তোমায়
ভাবার সময়।

কেন অবেলায়

কেন শুয়ে আছ অবেলায় খণ্ড ত-য়ের মতন··
খুব বড মেঘ মনে পড়ে নিশ্চল নিবিড, কোন
প্রভাতকিঙ্কর আছে অপেক্ষায় বাইরে বাগানে, লাল রোদের ভিতরে
খড়ি গুঁড়ো ইউক্যালিপটাসে কিংবা পেয়ারার ডালে বিষণ্ণ যেমন,
কিংবা মৃতের ওপর সুরভিদ্রব্যের নিষেকের
প্রথা প্রচলিত যথা ত্রিকোণ পাহাড়ে আফ্রিকায়,
আমাদেরও দেশে…সারাদিনই চলে প্রস্তুতির পালা—
জমিদারবাবুদের ফাঁকা বাড়ি মনে পড়ে যায়
অলিন্দে, চৌকোণো ঘরে, গোলঘরে, বাহিরমহলে
কোন লোক, পরিবার, কেউ নেই, আলস্য কি ভীষণ—
শুধু ম্লান গন্ধ ভাসে—কিসের তা জানা নেই—শুধু উচ্চে একটি জানলা
খোলা

একটি কাপড় খোলে ছাদ থেকে বনের পুকুরে একা রাজহংসরূপে...
যেমন সৌন্দর্য আছে বিশ্বাসের, কম্পাউন্ডারের
মেয়েলী বাক্সটি বাঁধা সাইকেলে, সদৃশবিধানাচার্য মনে,
তেমনি বড ভালো লাগে অবেলার অসংবৃত শয্যার ভিতরে
এই অসহায়তার মধ্যে সব খুঁজে পেয়ে আমি
বড় দৃশ্যে অঙ্গাঙ্গী এখন।

পিছন ফিরে

রাত খুব স্পষ্ট হলে দক্ষিণের দ্বার
জ্যোৎস্নাতেই ভরে যাবে, তখন মল্লিকা সাদা মোমের মুখের ভালবাসা
বুকে কাগজের যত সাবধানতার কৃপণতা
মর্মর জাগায়, শক্ত মার্বেলের স্মৃতির অক্ষর
গির্জার বাগান থেকে উঠে আসে। পিছনের সিঁড়ি
সদর দরোজা থেকে বহুদূরে। সদর দরজয়ে ভীতিপ্রদ
রোমশ কুকুর, গাড়ি, নেমপ্লেট ঝুলছে চিরদিন—
পাপোষ নরম কিংবা নারিকেল দড়ি অসম্পৃগ...
খিড়কির আকাশে শুধু চাঁদ কাঁপে, মেঘ থাকলে জোরে
চাঁদ দৌড়ে যায়, কোন শ্বেতবস্ত্রে আবাঁধা গোলক
পদক্ষেপে আন্দোলিত—এসো তবে পিছন দুয়ারে
শ্বেত রাত্রি ভরে যাবে উত্তপ্ত শয়নে,
ঐ মুখ ভালবাসা—নেমে যাব, কেউ জানবে না,
বাগানে বেড়াব, তুমি উনবিংশ শতক চিনেছে...
ছড়ি-হাড়ে পকেটে-গোলাপ আমি প্রথম যুবক।

বিদেশী গাছেরা সব

বিদেশী গাছেরা সব বেলভেডিয়ারের উদ্যানে
পুচ্ছ আন্দোলন করে, ঘোড়ার লেজের অতিকায় সব সহর্ষ কুন্তল

শূন্যে ঝুলে আছে···বড় ছায়াপান করে যাই রোদে ও জ্যোৎস্নায়
গড়ের ওদিকে মাঠে যে-ছায়ার আস্বাদ পিতলে
প্রবাসী রেস্তোরাঁগুলি শোভাযাত্রা করে যায় মাটিপাত্র, আগুন তুলিয়ে
মাঝে মাঝে। গ্রন্থভারে পীড়িত প্রাণীকে
বোকা বলীবর্দ মনে হয়, ডিরেক্টরি খুঁজে কোথায় ঠিকানা
পাওয়া যাবে পিঁজরাপোলের—
মিশনরী ব্রতে আর কাজ নেই, প্রেম এক গভীর কৌতুক,
নিউ গ্রেট রয়েল সার্কাসে ঐ মধ্যপদলোপী যেন কে লাফায়, নাচে···
ছেড়ে দাও সুতো ছাখো বিশ্বকর্মা পুজোর দিনের
চৌখুপি ভো-কাট্টা ঘুড়ি একশোখানা করতলগত—
গাছেরা এসব কথা বহুদিন আগে জেনে জগদীশচন্দ্রের হাতেই
ধরা দিয়ে গিয়েছিল—তারা প্রাণী, কথা বলে, সব বোঝে সমস্ত উদ্যানে।

স্মৃতি থেকে

ভোর চারটেয় (মহালয়া) রেডিয়োর বোতাম টিপেছি,
চা না খেয়ে কিছু শক্তি অর্জন করতে চাই চণ্ডীপাঠ শুনে,
জাতিতে ব্রাহ্মণ বলে এখনো কেমন যেন···কেন যে···কেন যে···
বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু স্মৃতিরই রচনা আমি কখনো ভুলি না—
মেজদির বাড়ি সেই জামসেদপুরের সেই লাল চুল্লী একদিকে, আর
অন্যদিকে ক্রমস্ফুট দলমা-টির দূর আকর্ষণ.
শীত পড়েছিল বলে মেজদির তরুণী ননদ
গালে যার তিল সে-ই নিজের গায়ের
র‍্যাপার চড়িয়েছিল আমার গায়েতে—
পরে ঠিক ওরকম চা-ও আমি খাইনি কোথাও।

শব্দের কারখানা

শব্দের কারখানা সব পাড়ায় পাড়ায় যত কবিতার
নতুন মডেল

অটোমবিলের এই পাঞ্জাবী কারখানাগুলি তুলনীয়

বলে মনে হয়...

শব্দব্রহ্ম এদেশের, রাজশেখরের ঐ চলন্তিকা নাম

হয়ত এই চক্রযানগুলি দেখে মনে এসেছিল—

কম্পোজিটরের বড় বিরক্তিও একই কথা ছাপতে

ছাপতে ছাপতে

ভিজেবেরালের মত এই সব নক্ষত্র, পিচুটি, আলো।

গোলাপ করবী

শিমুল অনেক ভদ্র, ঘুমোবার সময় বাঁচায়,

এপাড়া সেপাড়া জুড়ে বিশ্বকর্মা অনর্থক হাতুড়ি পেটায়—

কোন্‌খানে যাচ্ছে এরা—ডায়মণ্ডহারবার, টাকী, বারাসত,

হরিণঘাটায়

যাচ্ছে না কোথাও, কোন আমদানি নেই, শুধু কেবল খরচ

কালি ও টাইপ, পাতা, সব ব্যাড লিভিঙের রঙিন মুখোশ,

·· বিজ্ঞাপন দাও ওহে জগবন্ধু কবিতা ছেপো না—

ধন্য সেই উক্তিগুলি বাংলাদেশ কোমলস্বভাব

নদী, জল, সমতল, কৃত্তিবাস, রামপ্রসাদ বুড়ো...

মাঠের বাউলগুলি নগরের কবন্ধ বাতাসে

কোন ক্ষেত পাহারায় রত আছে, শেয়াল তাড়ায়—

সব ব্যর্থ, বিশ্বকর্মা, চলো তবে ঘুড়িই ওড়াই !

পাপের বদলে

খোলা জানলা দিয়ে শুকনো নিমপাতা ঘরের ভিতরে...

কিছু নিমপাতা ভাল ভোজ্যপাত্রে, আহার্যে অপরিমিত

স্বাদুতা অসমীচীন...এত যে অস্থির ভালবাসা

সুরু সেই কিশোরবেলায়, সমান বয়সী সব কিশোরীরা

একে একে চলে গেল বৃদ্ধদের হাতে, সেই হিংসা

এখনো ভুলি নি, ছাপাখানার ভেতরে বুঝি কয়েকশো হাজার ·

এক নাম ছাপতে ছাপতে ক্ষয়ে গেছি বলে
এখন কবিতা শুধু পাপ মনে হয়, ঐ সিনেমায় নৃত্যদৃশ্যে কে কে
মাথা নিচু করে ঢাকা দৃশ্যাবলী খোঁজে, কিংবা নগরের বাসে
পেনাল কোডের সব সম্ভাব্য শাস্তির জন্যে দায়ী হয়ে থাকে
সবাই যথার্থ ভদ্রলোক···
আমি অনর্গল শুধু নিমডালের দাঁতন চিবোবো,
কবিতার বদরক্ত ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হবে।

মানুষের প্রতি

রোজ উঠি ভোররাতে···এটর্নির বাড়ি
তখনো জ্বলবে সেই নীল আলো, প্রস্তুত সর্বদা
পেশাদার ফিটন গাড়িটা, কেন গাঢ় ইচ্ছা হয়
কুমারের মত সব ছেড়ে যাই কপিলবস্তুর.
নতুন হংসীর কোন মৃত্যু দেখেছি কি...বিকেলের স্বর
কিংবা রোদের উত্তাপ মাঝে মাঝে বাজে সব কাঠের দরজায়
ফার্নিচারে, হাতের মুঠোর মধ্যে জল পান করে
কত বিবমিষা, আমি শান্তিবারি বিশল্যকরণী
বিশ্বাসের সহজতা চেয়েছি, পাই নি, কেন, কেন
বড় মিথ্যা প্রমাণের প্রচেষ্টা মানুষ নাকি সুখী কিংবা সুখ ভালবাসে

চোর

সূর্যের অদৃশ্য সেই গোড়ালি উঁচিয়ে
বটগাছের পাশ থেকে রশ্মি ফেলি যেখানে সহজে
প্রবেশের অধিকার নেই, তীক্ষ্ণ চোখ দুটি ভীষণ বেরাল
মনে হয় কাঁদছে কিন্তু জল মুছে হাসির জলছবি
টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন হয়—স্থ ভিঞ্চি কি
এসব জানতেন, কি এমন মনোযোগ আছে
ছাপাখানার অক্ষরে, বন্ধুর চিঠিতে

দুপুরে দরজায় খিল দিতে ভুললে সমস্ত যে খাঁ খাঁ;
চোর ভয়ানক দেখে কোন হায় কেমন গড়ন।

নৃতত্ত্ব

কে তবে ভীষণ ব্যবহৃত···নক্ষত্রের নিশুতি মৌমাছি
আকাশের চাক বাঁধে, সব ফুল নখরনিষ্পিষ্ট,
মশকের জন্মভূমি পবিত্র শরীরে সেই রক্তের কণিকা.
কেন যে নিরভিমান এত সহ্য, যৌবনের মূল্য অপব্যয়;
কারা ষড়যন্ত্র করে প্রকাশ্যে, এখনো কেন বিমর্ষ দণ্ডায়মান আছে
সমস্ত রাস্তার মোড়ে অত্যাচার-প্রপীড়িত জন্তুদের খোঁজখোঁজ নিতে
টুপিপরা ভদ্রলোক। যৌবনই ত আর্কিমিডিসের
চৌবাচ্চায় ডুবে গেলে সাবানের শুভ্র ফেনা সুগন্ধ ওড়াবে
অপরিচিতের ডাকবাক্সগুলি ভরে যাবে বুমেরাং অস্ট্রিক চিঠিতে।

তিন চরিত্র

১. ঘুম ভাঙতে বিমলার মুখটা মনে এল,
বর্ষার বিকেলে ঐ রাধাকৃষ্ণ সেজে ছেলে দুটি
হারমনিয়মের তালে তাল রেখে জোরে হেঁটে যায়
তেমন বিস্ময় বড় স্মৃতির ভেতরে—
কেন মুখগুলি ভাঙা আয়নাতেই বিচিত্রিত হবে;
হাতে করে দোকানদার এঁকে রাখছে একশোখানা টিপ···
কোন্ দিক বেছে নেব, কোন্ হাওয়া, সমস্ত আমার,
প্রত্যেক ভাষাই এত আকর্ষণ করে বারবার···
হাওয়ায় এখনো ভাসছে বিমলার সেই কণ্ঠস্বর
চারিদিকে ওরই স্বাস্থ্য, ওর দর্প, তীব্র অহঙ্কার।

২. বৈঠকখানায় দিনে বসবো না একাধিকবার
মহাপুরুষের কত পদধূলি জমেছে ওখানে

মাদুরে, শীতলপাটি চিত্রিত শিল্পের অবিকল,
গন্ধর্ববণিক কাল এসেছিল রসদ জোগাতে...
জানলার ওপারে রাস্তা, ভালুকওলারা বড় যায় না এখন
শিশুকালে ভালুকের পিঠে যারা চড়েছে সবাই খুব বীর
কাঠঠোকরার কাঠ এখনো কানের মধ্যে গাঢ় বেজে যায়
স্কুলের প্রার্থনাগীতি সেই এক সেই এক বাজে—
এত যে বানানো দুঃখ মানুষের...মন এক পুরো ধাপ্পাবাজ,
বড় অসুখের বড় তকমাধারী ডাক্তার এখনো
ব্যবসায় ব্যস্ত আছে, ঘুরে বেড়াবার ছুটি চাই—
ছাদেই বেড়াবো নিত্য বৈঠকখানাটা থেকে দূরে, বহুদূরে।

৩. প্রায় সব বৃদ্ধকেই ভীষণ সুন্দর মনে হয়
বারবার জেগে ওঠে বন্যযূথিকার সেই সুশুভ্র গভীর...
আমাদের কাঁঠাল-ছায়ায় এসে বসতো দুপুরে গরুরা
রোমন্থনে ফেনা দেখে সাবানে বুদ্বুদ তোলা পেঁপের কাঠিতে
রোজকার খেলা ছিল...ওরা সব প্রাকৃত এখন,
সমুদ্র কি সরে গেছে পাহাড় কি গলে হল জল...
বিশুকাকাদের বাড়ি গাছে গাছে পেকে থাকছে অযত্নের কত পাকা ফল,
নিয়মানুবর্তিতার কাল গেছে, সূর্য বড়ো ওঠে কি নিয়মে,
দেয়ালে আমার জন্যে চতুষ্কোণ ঐ ক্ষেত্র সযত্নরক্ষিত।

এক যাত্রায় বহু পথিক

১. চারিটি চেয়ার আছে বৈঠকখানায়, বড় আধুনিক গড়ন-পেটন
আমার ছারপোকাগুলি রক্ত খায় অভ্যাগতদের
মডেলের ছায়া আঁকতে আঁকতে ও কে দেখে নিচ্ছে গোপন প্রতিমা
হাসির ভেতর আছে ফোর্টিন ক্যারেট দাঁত, রক্ত, পায়োরিয়া...
প্রত্যেকে এক কাপ চা ও হাফবয়েল ডিমের কুসুম
অবশ্য খাবেন, আর স্কুলের অভ্যাসগুলি যথাসাধ্য হোক বর্জনীয়,
স্টেনোরা সবাই কেন এমন সুন্দরী, কেন ল্যাংগুয়েজ ক্লাসে

কেবল ভাষাই শিখছে (শিখছে ঠিক ?) জার্মান, ফরাসী,
রুশ, তামিল, তেলুগু :
আপাতত দেখান দেখি কোনখানে মাথামুণ্ড আছে,
কেন চারিদিকে ন্যাকা দার্শনিক ধোঁয়ার বিস্তারে
যুক্তির সীমায় সব কার্যকারণসম্বন্ধ খুঁজেই চলেছি···
এখন কি ভাল লাগে ছারপোকা লাল লাল প্রবাল-পুলক,
কি সহজে টাকা করছে নানাভাবে আদার ব্যাপারী !

২. বাসে চড়ে যাচ্ছি আমরা, মাছের পোনারা এই তীক্ষ্ণ গ্রীষ্মকালে,
হাঁড়ির মধ্যেই ওরা হাত নেড়ে স্রোতের ভিতরে
জাগিয়ে রাখছে, ঐ অভিজ্ঞ ব্যাপারী
অক্লেশে অনেক কিছু বলে যায় (সাহিত্য সবার ক্রীতদাস),
ঐ মেয়েটির চোখে আদিম সারল্যে কোন প্রতিভা বিম্বিত,
এখন বিমিশ্র এই চারিত্র্যের সত্য বহুরূপী
সকাল সন্ধ্যায় বড় কাজলের সঙের মহিমা
বাসের ভেতর সুরু গণ্ডগোল নয়াপয়সার ।

৩. চাকরিটা গলার মধ্যে মাছের কাঁটার তুল্য, ঐ
ঝুলে আছে কাকতাড়ুয়ার কালো বাঁশের আগায়,
বিষম মৌচাক ঐ বেলা দশটার স্টেটবাস
মৃত্যু চলে যায় প্রায় ঝুলতে ঝুলতে সাক্ষাৎ যমদূত···
মানুষের কোনকালে সুখ নেই, এমন বেয়াড়া
বেহায়া অসভ্য জন্তু কিছুতেই তৃপ্তি পায় নাকো,
অমলিন দেঁতো হাসি প্রজাপতিনির্বন্ধ কারখানা
খুলেছে, কাগজে ঐ লজ্জাহীন অমুক সরকারে এত টাকায় কেরাণি·
খৈনি টিপতে টিপতে বললো রামু জমাদার
কতই দেখলাম বাবু রবিবারও রবিবার নয়
এমন অনেকে আছে ।···আমি অবিরাম সেই স্বপ্ন দেখে যাই
এক লক্ষ টাকা আমি অচিরাৎ লটারি জিতেছি ।

৪. বইগুলো এতদিন নির্মম পোকায় কেটে যায়

উই আর ইঁদুরের দেখো ব্যবহার একই ইত্যাদি ইত্যাদি···
সুর করে পড়া করে এখনো যে পাঠশালার পড়ুয়া—
জলপাণি অবশ্যই পাবে কেউ কেউ, হবে ক্লাসে মনিটর···
ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ক্যাপসুল, ঝোলাগুড়, বড়ি;
সবাই দিগ্‌গজ কিন্তু, ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে তারই নিদর্শন,
তালিকার ভারবোধে যোগ্যতার ভার মনে করে—
অনাবশ্যকীয় এত বোঝায় বিব্রত ক্লান্ত সহযাত্রী কে কে
সংসার গুছিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে, বিন্দুমাত্র দুঃখ সইবে না,
অচিন্তিতপূর্ব তবু বারবার বিপর্যয় আসে—
কাব্য, শিল্প কাচপাত্র···মুগ্ধতর কাচের পানীয়,
মূর্খেরা অনেক ভাল, একমাত্র নিজ ব্যক্তি ওরাই ত চিনে নিতে পারে।

বয়স ঢাকিনি

আমি কি ফুঁ দিয়ে তবে নিভিয়েছিলাম সেই প্রদীপের আলো
তৈলনিষেকের কথা মনেও ছিল না কিংবা পলতে ছিল সুতোর আকার
কোন কথা বিশ্বাস করে নি কেউ। অন্ধকারে গ্রীসের দেবতা
চোঙা হাতে হাওড়া স্টেশনে এসে গাড়ি ছাড়বার কথা অদৃশ্যে বলেন
আমাদের কথা কিন্তু তারও চেয়ে নিম্নউচ্চারিত, সব প্রযত্নের মুখে
কিসের সঙ্কোচ সেই পাথরের বোঝা এনে সামনে ফেলে দিল
আমার মুখের সামনে অবিরাম ঝুলতে ঝুলতে মাংসপিণ্ডগুলি
গোলাপের গন্ধে ভরে গেল, আর হাতের বল্লাটা বড় অসহায়,
মোটে শিথিল হল না,
বয়স ভীষণ শত্রু, এত সংস্কার জমে, এত যে পাথর।

সাহেবপাড়ার মাঠ

গলফ্‌ কোর্স থেকে সেই সমতল হাওয়ার অতল
তৈলহীন চুলগুলি উড়িয়ে দিয়েছে কোন উচ্চতম ঘাস,
আমি অমন ফড়িং হতে ঠিক চাই নি বরং

বর্ষায় কেমন কাটছে শক্ত হাত ঘাসের বাণ্ডিল
গুচ্ছ করে ধরে, ঐ গভীরতা শাশ্বত ভঙ্গিমা
অনাবশ্যকের মধ্যে আছে সেই রাজকীয়তার
উচ্চারণ, যেমন নির্জনে আছে, স্পর্শে,
শব্দের ভেতরে সেই অন্তরচারিতা, কোন হারানো ফুলের
গন্ধ এক মুহূর্তের সুতীব্র স্মারক, সে বয়স ঘটনা বিপুল
দুঃখ মাঝে মাঝে এত সময়ের ফাঁক পূর্ণ করে···
দূরের শহরে জ্বলছে আলো, দূরে কারখানার আকাশ
বড় লাল, বড় দক্ষ দগ্ধের সীমানা...
গলায় অনেক হাওয়া, ফোলে বস্ত্র সমস্ত ফসফুস
দুবার তিনবার নাম ডাকতে ডাকতে ভয় করে এত ভদ্র ভয়
সুখের অসুখে কতবার ভুগেছি তা গুণে বলতে পারি।

মুখ না দেখে

ছাতার দোপাটি সব লজ্জা ঢেকে ফেলবেই মুখের
কারণ মুখের সেই মেঘ-ছায়া সূর্যাস্ত ঢেকেছে,
কোন লালই চোখে পড়বে না। হায় রে, মন্থর
গাড়ির চাকার ধুলো সিনেমার দৃশ্যগুলি বদলে মুছে দিলে
কে যে কাকে দায়ী করবে, অপ্রণিধানের দায় কার,
কেউ অভিধান খুলে বসে নেই রৌদ্রেদ্ধ বাগানে
চিরদিন, ভীষণ ফিরিঙ্গি সেই কুকুরের ধর্ম-আচ্ছাদনে
নিজেকেই সঁপে দেওয়া, অনুযোগ বড় অপ্রার্থিত···
অসম্ভব করুণায় উড়ে যাচ্ছে দুটি প্রজাপতি
পায়ের তলায় কাঁপছে একজোড়া জুতোর ঝিকমিক।

গোলাপবাগান আজো

রেলগাড়ির আলাপচারিও মাঝে মাঝে চিরস্থায়ী হয়,
কিছু কথা কেন চিরদিন ধরে নিজের শক্তিতে

ভাসমান, চলমান......বিবর্ণ, ধুলট, ম্লান কত চেনাজানা—
সামাজিকতার থেকে বহুদূরে আমরা স্বাধীন
কেন মুহূর্তের দান বারবার ফোটে না বাগানে
এত সারপদার্থের মায়া ও মমতা, ছায়া, আলো অন্ধকার
কুয়ো কি গভীর করে খোঁড়ে কেউ গোলাপ বাগানে
হিতৈষী প্রস্তাব কার কাছ থেকে পাওয়া যাবে যখন তখন—
অনায়াসে বাতি জ্বালছে বাতিওলা লাঠির আগায়
রক্তাক্ত খোঁচার ঘায় কেন জেগে ওঠে না হৃদয়
কেন হতে চাই শুধু ঘুরেফিরে প্রশান্ত নির্বোধ
কে আজো আয়নার সামনে নিজেকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে !

পেয়ারাবাগান

বারুইপুরের রাস্তা পেয়ারার উজ্জ্বল বাগানে
ভরে আছে, নাতিদীর্ঘ, হ্রস্ব, কৃশকায়—
আমি আপেল দেখি নি পাহাড়ের অনেক উঁচুতে,
জঙ্গল অনেক দূরে......বাগানই কি জঙ্গল আমার......
পেয়ারাবাগানে আমি বুড়ো মালীটার পাশাপাশি
টো টো করে ঘুরে বেড়ালাম, আমি লাঠি হাতে করে
একটি দুটি তিনটি কাক তাড়িয়েছি, তবু
ফলে ত আমার আর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই—
অনেক গল্পের মত মুখ খুলছে আবদুল লতিফ
বিশু পেয়াদার মেয়ে কেন ঝুলেছিল সাদা পেয়ারার ডালে··
সব কটি বাগানের আলোছায়া পাগলাঘণ্টি ছুটির দুপুর—
পিকনিকে যাবে কি কেউ বাসভর্তি মায়াবী সকালে
পেয়ারার মত স্বাস্থ্য কেন নেই, কই রং, কোথায় সেদিন।.

যখন যেদিকে প্রেম···

সাহেবভূতের কণ্ঠ নীলকুঠির পোড়ো বারান্দায়—
সব কিছু সঙ্গে এল সশরীর, এরকম গাছও নাকি হয়

এখানে কাগজ কেন পড়ে থাকবে, কেন চামচিকে
অমন কিচিরমিচি ডাকছে অবিরাম ঐ কাঠবেরালীটা
পচা পুকুরের জলে নেমে যাচ্ছে—সব ব্যাকুলতা
শুধু কি সাজানো ছিল নৈকট্যের স্মারকচিহ্নিত
ছলনাও মাঝে মাঝে চন্দ্রশোভা জ্যোৎস্নায় নিবিড়—
ভয় কি প্রেমের পূর্ণ সহায়ক, পরিবেশ বড় অকপট,
কতকাল নীলকুঠি ভেঙে গেছে সেই ক্ষণভ্রান্তির বিলাস।

২. দুপুরবেলার একা নিজস্ব টানের মধ্যে আবেশ জাগাও,
কেন মাদুরের সুখ সহজ নিদ্রায় ছিল অযত্নপ্রয়াস
তাম্বুলরঞ্জিত সেই দিনগুলি...বিচিত্রিত গ্রাম্য পাখিগুলি,
বাইরে গোক্ষুর ধুলি উড্ডীন, আকাশ কেন বিদীর্ণ ধূসর—
অমন হবে না তৃষ্ণা, আকণ্ঠ পানীয় শুধু ঢেলে যাও
অনর্গল, গলাধঃকরণে বিষমাত্র মনে হবে। সবাই চলেছি,
একদেশদর্শিতার থেকে কারো মুক্তি নেই, কবন্ধ কুটিল,
সেই গন্ধবহ প্রেম এলোচুল কতকাল ভুলেও দেখি না।

৩. জ্বর বড় মাঙ্গলিক, এত সুখ সচারাচরের
গন্ধ স্পর্শ বয়ে নিয়ে যায়, এত তীব্র ব্যাকুলতা,
নদীর পারানি কড়ি হাতে করে কেউ আছে বসে,
আমরা নিকট খুবই, পাশাপাশি পাখি কোন স্বক্ষেত্রসমীপে...
বাল্মীকিবৃদ্ধের মুখ মনে পড়ে, আর্ষ অহঙ্কারে
সমর্পণ করা কি সহজ...ঐ জানালার বিশাল ওপারে
কি আশ্চর্য বড় হচ্ছি, অস্ত আলো বৃক্ষের চূড়ায়।

ঘর খুলে বারান্দায়

১. দরজা থেকে হেঁটে গেলে কতদূর ঘর...
গৃহপ্রবেশের জন্যে ও কি তবে মাঙ্গলিক উৎসব কিছুই
করে নি, কোথায় কারো জোড়া জোড়া ঝিকমিক জুতোর
চিহ্ন নেই কোনোখানে। পুকুর আছে কি উল্টোদিকে—

এবার ছেড়েছে মাছ, গতবার ছিপের আগায়
লালায়িত একাগ্রতা ছিল যেন কোন ঠিকানায়,
কে তাকে পৌঁছিয়ে দেবে সেই শান্ত নির্বোধ সময়ে—
বয়স পাপিষ্ঠ নাকি কেউ তাকে দুচোখে দেখেছে...
দরজায় দাঁড়িয়ে আছে বয়সের বুড়োটে পণ্ডিত।

সূর্যকে প্রণাম কোরো গুণে দশ বার
তালগাছ ছাতা খুলে আছে দীর্ঘ দিন—
নিজের সম্রাট হও বারান্দায়, বৈঠকখানায়
বংশপঞ্জি ঝুলে-থাকা কি এমন অসম্ভব কাজ,
স্বয়ংশাসিত সে কে বসে আছে ঘরের ভিতরে
হাওয়া প্রজাপুঞ্জ ঐ খোলা-জানলা দেখলে ভিড় করে,
সদরে-খিড়কিতে শুধু নাম ধরে ডাকা সারাদিন,
সমস্ত ইঙ্গিত যেন হাতছানি আজ—
কোন্ দিকে যাওয়া ভালো, সূর্যের প্রণামে কিংবা পিছনে পুকুরে

কোনো গোপনতা আর রাখি না সহজে আজকাল,
কেন যে রজনী তাকে দরজা খুলে দিতে গিয়ে একা
পিছিয়ে এসেছে ভয়ে...গাছপালা অবান্তর ম্লান পটভূমি,
ছিন্ন বকুলের ভাষা উড়ে-যাওয়া সারসীর ডানা,
যেমন জাহাজ চলে গেলে মনে হয় এক সম্রাটের গতি
ডায়মণ্ডহারবার প্রশস্ত গঙ্গায়
তেমন কে আছে আর ঘর খুলে কে আছে বাহিরে—
বারান্দায় বুড়োটে কে একগাদা রসিদ দুহাতে,
এখুনি বেরিয়ে যাবে অল্প আন্দোলনে সেই মহামূল্য ভাষা
কেউ আর গোপনতা রাখবে না অত সহজেই।

এখন এ কোন্ ছায়া সহজ সরল হয়ে এল—
ও-হাওয়া ভনিতা রাখো, প্রতিবেশীদের
পরশ্রীকাতর ক্লান্ত মুখগুলি, নিষ্প্রদীপ ঘরের বাহিরে
শুকনো ঘুড়ির মাথা আটকে আছে অসহায়ভাবে,

রজনী আসেনি, দূরে বারান্দায় জোড়া জোড়া পায়ে
এমন পায়চারি আর কতদিন, ধুলো লাগবে না…
ম্লানতা আমার কণ্ঠ কতদিন চেপে ধরে থাকে !

বাতাবীতলা

আজ এই বাতাবী গাছের নীচে একলা দাঁড়ালাম ;
বাতাবী লেবুর বল গড়িয়ে গড়িয়ে কবে মস্ত ময়দান
পায়ের তলায় ছিল, কিংবা কালো শহুরে কাকেরা
এরকম কয়েকটা গাছেই নিবাস করতো সেই আবিষ্কারে
সারাদিন কবিতা লিখতাম, আর কবিতা লিখেই কত
সময়ের অপব্যয় করেছি সেদিন, কিংবা ওদের মাধবী
ফুলের স্তবকগুলি ডালপালায় মিলেমিশে অনেক দুপুরে
গন্ধের বিমিশ্র রূপে আচ্ছন্ন আবিষ্ট করলে বড় হয়ে গেছি
মন বলতো, ওবাড়ির অনেককেই মনে হত এত কি আপন……
এখনই এগিয়ে আসছে গল্পগুজবের সেই ম্লানতম কাল
ছায়ায় চাতালে বসবো অন্ধকারে গন্ধের আড়াল
কেন অকৃত্রিম ফুল চেয়ে থাকবে এতদিন, এত দীর্ঘ দিন…… ।

এখনো যে প্রেম

জানলায় প্রথম রোদে মনে হবে কমলালেবুর
শুভ আশীর্বাদ, বুনো ডালিমের লাল লাল ফুলে
এখন বৈচিত্র্য বুঝি নেই, পাড়াগাঁয়ে পাগড়িওয়ালা
মস্ত আফগানী, কিংবা দাসেদের মন্দিরসোপানে
মসজিদের আদল কিছুটা, আমাদেরও মুখ
কত যে সহজে মিশে আছে…মোটে আয়না দেখি না,
জানি এই মিশ্রণের বাধা নেই, অবিকল বৈশিষ্ট্যের
আর্য গম্ভীরতা কেন বজায় রেখেছ, আমি সমস্তের স্বাদ
প্রবল গভীরভাবে পেয়ে যাই…গাছ নাড়া দিলে
কেবল পাতারা পড়ে চারিদিকে, তোমার স্পর্শের

অভিজাত চিহ্ন সব, তোমার মধ্যের ফুলগুলি
কেন বারবার ঐ চারিদিক বুক ভরে আনে…
এখন বিমিশ্র এই ভাললাগা এ দিনরজনী,
আঙুরগুচ্ছের চেয়ে আর বেশি লাবণ্য দেখি না।

২. সাদা ঝরনাটার চেয়ে আর কোন প্রকৃত প্রস্তাব
আনো নি সেদিন…আজ দূর, শুধু কতদূর
রাস্তার মাইল-পোস্ট গুনতে গুনতে একাগ্রতা
বিদ্যাসাগরের এখন দুর্লভ…আমার মুখের দিকে
চেয়ে দেখেছ কি—কতকাল সৌম্য মুখ আমিও দেখি নি,
পেছনের দিক থেকে দেখা সেই ফলফুলগাছের আড়ালে
বিষাদের রমণীয় চাঁদের বুড়িটা ঠিক জলের ছায়ায়
সেকেলে চরকার সঙ্গে কোন গান গাইছে এখনো
আমি যা শুনতে পাই, তুমিও শুনেছ, কিন্তু প্রকাশ করি না।
সাদা ঝরনাটার গায়ে দেখো বড় তরল সঙ্গীত—
জলে কোন রঙ নেই…তুমি কতদিন ধরে থাকবে রঙিন!

৩. সূর্যাস্ত কি মনে থাকবে, মন বড় ভারী আজকাল
অমন ফোঁটার চেয়ে বড় ফোঁটা কোনদিন পড়ে…
কাজল মোটেই কোন বাধা নয়—কেন আত্মহারা
শিশুটির দৌড়ে যাওয়া, চলে যাওয়া এখনো সহজ—
আকাশ বাড়ির ছাদে অন্তর্হিত, দিকচিহ্নহীন
সব একাকিত্ব আজ ফুটে উঠছে, সেই বিনিদ্র বিজন
কেন আছে অসহায়তার এক রুক্ষ দাবি নিয়ে,
সূর্যমুখী যাবে নাকো সূর্যের বাগানে—
দুপুরবেলার ক্লান্তি নেমে আসছে ঘর থেকে ঘরে
গোলাপের কাঁটা ঐ কাঁটাফুল বড় অমসৃণ।

জীবনকথা

কেন পদচারণার ক্ষেত্রটুকু বিস্তৃত হবে না।
ঘরের ভেতর জমছে এতগুলি ছুড়ি, ঘড়ি, কমলা, ডালিম

পশ্চিমে সূর্যের গায়ে অকাতর ক্লান্তির প্রতীক
কেন রাত্রি দিয়ে গেছ দাও নি প্রদীপ—
সদর দরজায় কে কে এসেছিল নাম মনে আছে ?
সব না ভুললেও চিনি মিউনিসিপ্যালিটির কেরোসিন বাতি,
সেদিন ঘরের মাটি কেটে নিয়ে গেছে কোন চোর,
সিঁদকাঠিটির ভয়ে শিকেয় ঝুলিয়ে রাখছি সমস্ত আমার···
তালপাখা কার নামে ভরে আছে, পুরনো ইস্কুলে
বেঞ্চিতে অনেক নাম—মুদ্রাদোষে ভোগে কোনজন
যেতে যেতে থমকে পড়ে, আবোলতাবোল কিছু বলার আগেই
আমরা পালিয়ে বাঁচি—হয়ত পদার্থ ছিল, কিছু ছিল, হয়ত নিশ্চয়—
এখন নিঃসঙ্গ কালে বারান্দার বাঘবন্দী ঘরে
নিজেকে টুকরো করে কেন ভাঙো, কেন যেন খেলো দুইজন।······

ক্লান্ত পুরুষ

অতিশয় পরিচিত এই ঘনিষ্ঠতা এর প্রতিকার কিসে,
সমস্ত চিন্তার জট একে একে খোলা সমীচীন
সমস্ত বইটা যেমি লাল-নীল পেন্সিলের দাগে
ভরে যায় পরীক্ষার আগে, কিংবা সাধারণজ্ঞানে
কয়েকটি তারিখ মাত্র মনে রাখা গভীরতাহীন—
এত বিমিশ্রতা নিয়ে পড়ে থাকা বিশ্রুত মেলায়
ব্যবহৃত দর্পণের আলো কিংবা অন্ধকার রূপোলী ঠিকরোয়
কখনো দূরত্ব বাড়ে নদী, বালি, নদী, বালিকণা
নিকটের ভাষা কেন মনে হয় বিকট চিৎকার,
ডুবুরীর মত কেউ ডুবে আছে জলের অভ্যাসে,
পরিচয় কি সহজ কত শক্ত মোটেই ভাঙে না।

অন্তিম শিখর

ভাঙা চৌকাঠের পাশে মাঙ্গলিক কলাগাছ নেই
ছাগলে মুড়িয়ে খেয়ে চলে গেছে···খোঁয়াড় অভাবে

আমার দুকূল গেল…কেনা যেত বিড়ির বাণ্ডিল
লাল-সুতো জাহাজ-মার্কাই আজো বাজারের সেরা, গ্যাখো কার পাপে
বছরবিয়োনী সেই গরুটা থেমেই আছে, আর তার ঐতিহ্য এখন
খুকুর মায়ের মধ্যে নির্মম বর্তেছে জানি ; যদিও এতেই
সংশ্লিষ্ট সমস্ত বার্তা ফুরোবে না…অন্ধকারে অভ্যাস এমন
ঠিক জায়গাতে ঠিক নির্ভুল হাতের চিহ্ন, গলির ইঁদুর
কেমন নিশ্চিন্তে দৌড়ে চলে যায় শহুরে সকালে—
পারিণামদর্শনেই প্রাজ্ঞজন, আশ্চর্যের কোন ছায়া নেই,
নিষ্পত্র দুপুরে একটি কিংবা দুটি ঘুড়ি, ছেলেখেলা…
লঘুকরণের গুণে পাঠশালার দগ্ধ পরিবেশ
মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়—

কেন আলো, কেন অন্ধকার

শেষ লগ্ন কেন মনে হবে ধুলোপায়ের লগন,
দোলাচলে ফুটে উঠছে গাঢ়তম রক্তের গোলাপ,
উত্তর হয় না, কিংবা স্বতঃসিদ্ধ, বিশ্বাস গভীর
এখনো মানুষ আছে, মানুষেরই ঘর ঐ অন্তিম শিখর।

২. নষ্টামির অভ্যাস মরে না—সুন্দরে নিষ্ঠুর মিশে আছে,
কাঠপুল পেরিয়ে যেতে সেই বুড়ো হ্যাংলা বটগাছ
এখনো দাঁড়িয়ে আছে, রাশিকৃত মানতের ঘোড়া
পদমূলে জিজ্ঞাসার ছবি…নিরুত্তর, ভাঙতে ইচ্ছে করে ;
পোড়োবাড়িটার ম্লান দেয়ালে ভাস্কর্য, নষ্টলিপি,
উড়োচিঠি মাঝে মাঝে—চাঁদা যদি না-ই দেন এ-পাড়ার ক্লাবে…
গামছাটা অদৃশ্য হয় ব্যাপারীর, ঝুড়ি খায় দূরে গড়াগড়ি…
লুক্কায়িত রক্তনখ ঢাকা পড়ে গেছে কার রোমশ পোশাকে
বৃক্ষের মধ্যেই সেই সঞ্চারিত অগ্নির প্রদাহ…
মন্দির ঢাকুক ফুলে, জনসমাগমে ভয়ে যাক দিগ্বিদিক,
এখনো কে পেটাঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে তার অশেষ যৌবনে ?